Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 184–195
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাগবত অনুবাদের ভাবনা ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে তার প্রভাব : একটি অন্বেষণাত্মক পাঠ

বাবাই দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: dasbabai012@gmail.com

Keyword
সংস্কৃত ভাগবত অনুবাদ ভাবনা, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য, মালাধর বসু, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

Abstract
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই প্রভাব পরবর্তী সাহিত্যে কীভাবে ও কতটা পড়েছে তা আলোচনার অবকাশ রাখে বিশেষভাবে। সংস্কৃত ভাগবত যখন বাংলা ভাষায় অনূদিত হল, তখন বৈষ্ণবসমাজ ও সাধারণ পাঠক সমাজে এর যে অত্যন্ত আদর হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। বাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি ভাগবত অনুসরণে লেখা। কোনো একটি গ্রন্থের অনুকরণ বা অনুসরণ তখন হয়, যখন গ্রন্থটি জনসমাজে-বিশেষ করে পণ্ডিত সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠে। মূল গ্রন্থের ভাব ও রসে আকৃষ্ট হয়েই কেউ কেউ সেই গ্রন্থকে ভাষান্তরিত করে থাকেন। সেই দিক থেকেই প্রথম কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। রচনাকাল ১৪৭৩-৮০ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ পঞ্চাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। মালাধর বসুর হাত ধরেই আমরা অনেকগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য পেয়ে যাই। যার মধ্যে রয়েছে- মাধবাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ রচিত 'গোপালবিজয়', দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল', পরশুরাম রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', ভবানন্দের 'হরিবংশ', অভিরাম দাসের 'গোবিন্দবিজয়' ইত্যাদি। এইসব রচনার মধ্যে কবিরা কখনও ভাগবতকে অনুকরণ-অনুসরণ করেছেন, কখনও স্বকপোলকল্পিত কাহিনিকে জুড়ে দিয়েছেন, আবার কখনও বা ভাগবত কাহিনির গ্রহণ, বর্জন ও সংক্ষেপণও করেছেন। এই বিষয়গুলিই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

Discussion
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে প্রধানত মুসলমান শাসনকালে। এই বিদেশী ভিন্নধর্মী মুসলমান শাসনাধীনে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃত পুরাণ ইতিহাসের চর্চা শুরু হয়েছিল লৌকিক ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে পুরাণকথা। সেকালের বাঙালি-মানস পুরাণের মধ্য থেকে দুটি বস্তু বিশেষভাবে আহরণ করেছিল—একটি ভক্তিরস, অন্যটি গল্পরস। মধ্যযুগের আখ্যায়িকা পাঁচালির অধিকাংশ কবিই এই দুই ভিন্ন বস্তুকে এক জায়গায় মেলাবার চেষ্টা করলেন। এই কাজে কেউ পুরাণের পথে এগিয়েছেন, কেউ বা লৌকিকের

পথ ধরে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা সাধারণত ত্রিবিধ। এক, পৌরাণিক আখ্যায়িকা পাঁচালি; দুই, লৌকিক আখ্যায়িকা পাঁচালি; তিন, গীতিকবিতা। আবার পৌরাণিক পাঁচালি কাব্যের তিনটি ধারা— একটি ভাগবত অনুসারী, একটি রামায়ণ অনুসারী, অপরটি মহাভারত অনুসারী। কিন্তু বলা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ কৃষ্ণকথাময়। আর ভাগবত অনুসারী কাব্যগুলিই এই অংশের অন্তর্গত। মধ্যযুগে কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ এবং মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। যদিও মালাধর বসু ভাগবতের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবাদ করেন নি। তবুও বাঙালির অনুবাদ-শক্তির প্রথম সফলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুই ধর্মীয় গ্রন্থের কথাই বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙালির এই প্রথম অনুবাদ কীর্তিকেও অনেকেই 'কৃত্রিম ফরমায়েসী' প্রচেষ্টা বলে মনে করেছিলেন। তাঁদের অনুমান এই যে, হিন্দুদের ধর্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি জানার জন্য সম্রাটগণের কৌতূহল অনেকটাই ছিল। তাই সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল। তাঁদের মতে বাংলা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত নাকি মুসলমানী উৎসাহে ও সুলতানী কৃপায় উদ্ভুত—

> *"মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন, হিন্দুরাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমিদারগণ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালাভাষা এইভাবে হিন্দুরাজ-সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া ইহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন।"* [১]

কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মধ্যযুগে হিন্দু শাস্ত্র অনুবাদের ভাবনা কোন বাইরের তাগিদ থেকে আসেনি। সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালির এই অনুবাদ-চর্চা হয়েছিল। প্রয়োজন আন্তরিক ছিল বলেই এই অনুবাদ হয়েছে সজীব, সরল ও সাধারণের বোধগম্য। পাঠান রাজত্বের প্রথম দিকে দেখা যায় বাংলার পল্লীর আসর বিভিন্ন প্রকার ইতর ও অশ্লীল 'ধামালী' নাট-গীতের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এই সব 'ধামালী' কাব্যের রচনার বিষয়বস্তু প্রাক্-আর্য জীবনের আদিমতা হবার কারণে রস-পরিবেশনের ছলে তা হিন্দুর নৈতিকতা ও দেব মাহাত্মকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। সে সময় বাঙালির দেব-দেবী যথা-- শিব, কৃষ্ণ, দূর্গা সকলেই হয়েছিল লাঞ্ছিত। এর প্রমাণ হিসেবেই বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কথা। যেখানে ভগবান কৃষ্ণ অঙ্কিত হয়েছিলেন কামুক ধর্মজ্ঞানহীন নিষ্ঠুর নারীধর্ষক রূপে আর দেবর্ষি নারদ পরিণত হয়েছিলেন 'বোকা ছাগে'। সেই সময়ের শিব-ধামালীতে মদনভস্মকারী দেবাদিদেব ভগবান শিবও যে কোচ-রমণীতে আসক্ত বৃদ্ধ লম্পট রূপে পরিচিত হয়েছিলেন তার নিদর্শন পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ণ কাব্যে। তৎকালীন কবিগণের এই ইতর রসিকতা ও ভাড়াঁমিতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের ধর্ম-শরীর হয়ে উঠেছিল ক্ষতবিক্ষত। সেইজন্য আহত ধর্ম-চেতনা মাথা না তুলে থাকতে পারেনি। সেই কারণেই হিন্দু ভদ্র সমাজ জনসাধারণের কাছে হিন্দু পুরাণের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। রাজকীয় সম্মান বা সম্পত্তির লোভে কৃত্তিবাস বা মালাধরের মত কবিরা কলম ধরেন নি, সত্যিকারের সামাজিক কল্যাণবোধে ও ধর্মীয় প্রয়োজনবোধে তাঁরা অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন।

মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাগবত কেন অনূদিত হল সেই প্রসঙ্গে দুঃখী শ্যামদাস তাঁর 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকা অংশে সুন্দর একটি বিষয় জানিয়েছেন, এখানে সেটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি--

> *"লোকহিতচিকীর্ষু ভগবান বেদব্যাস বেদের নির্য্যাসরূপ তত্ত্বমহৌষধকে কৃষ্ণলীলামৃত রসে মিশ্রিত করিয়া ভবরোগগ্রস্ত জনগণের অতি সুখসেব্য ও উপাদেয় করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু তাহা সংস্কৃত ভাষার কঠিনতর আবরণে আবৃত থাকাতে সর্ব্বসাধারণ লোকে তাহা সেবন করিতে পারে নাই। যখন সংস্কৃতচর্চ্চা ক্রমশঃ খর্ব্ব এবং বাঙ্গলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ঋষি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের ঐ সকল স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ হইবার প্রয়োজন হইল।"* [২]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাগবতপুরাণ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বিষয়, বিন্যাস ও রসের আধিক্যে। ভাগবতের বিষয়-বৈচিত্র্য বাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতে যেমন নানাভাবে স্থান পেয়েছিল তেমনি পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যেও ভাগবতের প্রভাব পড়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির ওপরও ভাগবতের প্রভাব অস্বীকার করার জায়গা নেই।

ভাগবতের অনুসরণে মধ্যযুগে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনার একটা স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। এছাড়া চৈতন্য প্রচারিত ভক্তিধারার উৎসও বলা যায় ভাগবত। গীতা চট্টোপাধ্যায় এর উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

> *"এযুগে বঙ্গভাষাতেই ভক্তিচর্চার অধিক প্রসার ঘটেছিল। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কালসীমাটিকে আমরা পুরাণ-অনুবাদের সুবর্ণযুগ বলতে পারি। রামভক্তির প্লাবন এনে এযুগে কৃত্তিবাসই প্রথম 'ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা' ইত্যাদি অভিশাপকে অতিক্রম করেছেন। মহাভারত অনুবাদের প্রাথমিক পর্বেরও এযুগেই সুত্রপাত। তদুপরি ব্যাপকতা লাভ করেছে ভাগবতানুশীলন।"* [৩]

মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাগবত অনুবাদের ভাবনা হঠাৎ করে একদিনেই আসেনি। মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর থেকে ধীরে ধীরে মধ্যদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে এবং গুপ্ত রাজাদের সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রবিধি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। গুপ্ত রাজাদের সময়কালেই 'বেদজ্ঞ' ব্রাহ্মণের প্রভাব বাংলাদেশে প্রবল হয়। এইদেশে বৈদিক যাগযজ্ঞ আগে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি। কারণ বৈদিক কর্মকাণ্ড উপনিষদে প্রত্যাখ্যাত। তাই বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিয়ে তাদের জমিজমা দিয়ে বসতি স্থাপন করানো রাজাদের মানবৃদ্ধিকারক বলে মনে করা হলো। এই নবাগত ব্রাহ্মণেরাই রাজসভায় আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত শাস্ত্রশাসিত আচার-অনুষ্ঠান-ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সমাজের উচুস্তরে প্রবেশ করাতে থাকলেন। এইভাবেই রাজসভায় কবিদের দ্বারা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনী প্রচারিত হয়েছিল। এই নবাগত ব্রাহ্মণেরা গৃহদেবতা রূপে বিষ্ণু-শিব-চণ্ডীর পূজার পোষকতা করতেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে বলেছেন—

> *"হিন্দু রাজকর্মচারীদের প্রভাবেই বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতানেরা কেহ কেহ কবি পণ্ডিতের পোষকতা রাজকর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। কর্মচারী অথবা সভাসদ হইলে কবি- পণ্ডিতকে তাঁহারা সাধারণত উপাধি দিতেন। সে উপাধির শেষের অংশ তুর্কী শব্দ অব্রাহ্মণ হইলে 'খান' ব্রাহ্মণ হইলে 'মিশ্র'।"* [৪]

দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে পূর্ব ভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। তারপর থেকে প্রায় দু'শ বছর বাঙলা দেশে অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা চলে। দেশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির যে সব প্রধানকেন্দ্র ছিল তা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। এর পূর্বে বাংলা দেশে কোনো বিদেশী শক্তির এমন ব্যাপক আক্রমণ হয়নি। এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজশক্তি বা জনসাধারণ কেউই প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্য এই আকস্মিক আঘাতে দেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টীয় ১২০০-১৪৫০ অব্দের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যেমন কোন নিদর্শন চোখে পড়ে না, তেমনি বাংলা ভাষারও কোন কিছুই পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় লেখা বই ও গান কিছু কিছু পাওয়া যায়। যদিও বলা যায় যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত কিছু ছড়া এবং গান সেই সময় রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু একটি কথা বলা যায়-- এই সময়ে মনসার কাহিনি, ধর্মের কাহিনি, চণ্ডীর কাহিনি ইত্যাদি দেশীয় উপাদান এবং রামায়ণ কাহিনি, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয় গান বা পাঁচালি আকারে গ্রাম উৎসবে বা দেবপূজা উপলক্ষে দেবমন্দিরে পরিবেশিত হত--

> *"বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগের পর এই পৌরাণিক যুগ-সাহিত্যই দেবভাষার অক্ষয় কীর্তিভূমি। ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাবের পটভূমিতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের উপায়স্বরূপ পৌরাণিক সাহিত্যের প্রয়োজন ঘটেছিল। বাঙলাদেশেও প্রায় অনুরূপ যুগপরিবেশেই ব্যাপক পুরাণ-গ্রহণের সূত্রপাত। তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালী পৌরাণিক যুগের বীরমহিমাকে আশ্রয় করেছিল। সমাজ ও জাতির আন্তর প্রয়োজনে সেদিন অজ্ঞাতসারেই বঙ্গীয় কবিসমাজ পুরাণ পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের রাম-চরিতের মতো মালাধরের কৃষ্ণচরিতও নির্জিত জাতির সম্মুখে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই নব-পুরাণিক যুগে বিরচিত কাব্যগুলিকে অবশ্য কোনমতেই পুরাণ বলা চলে না। পুরাণের চেয়ে বরং মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালির সঙ্গেই এদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অধিক।"* [৫]

তুর্কী আক্রমণের পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা সংস্কৃতি আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। মুসলমান রাজশক্তি তখন বাংলার শাসনে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণে বাঙালি হিন্দু বিশেষ তৎপর। লক্ষণ সেনের সভা ভেঙে গেলেও প্রজাদের ওপর থেকে তাঁদের প্রভাব তখনও মুছে যায় নি। কিন্তু এরপর ইলিয়াসশাহী সুলতান বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষমতা লিপ্সু হিন্দু রাজারা আবার গৌড় দেশে জমায়েৎ হয়ে পুরানো সংস্কৃতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। সেই সময় শক্তিশালী হয়ে রাজা গণেশ কিছুদিনের জন্য সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ঘরে-বাইরে মুসলমানদের চাপে তাঁকে সিংহাসন

ছাড়তে হয়। সিংহাসন ত্যাগের পর তিনি পুত্র যদুকে সিংহাসনে বসিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হলেন জালালুদ্দিন। এই পিতা-পুত্রের রাজত্বকালের কয়েক বছরের মধ্যেই গৌড় দরবারে হিন্দু পণ্ডিত-মনীষীর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভাগবত-পুরাণ অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় অনেকগুলি কাব্য রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সবগুলিই যে ভাগবতের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ তা বলা ঠিক হবে না, বরং মূলানুগ অনুবাদ বলতে যা বোঝায় বাংলা সাহিত্যে সেই ধরনের গ্রন্থের সংখ্যা খুব অল্পই। ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণচরিত কাব্য রচনা করতে গিয়ে বেশিরভাগ কবিই বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই কথাও বলা যায় যে, পুরাণবহির্ভূত শ্রীকৃষ্ণলীলার লৌকিক ধারাটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সব থেকে বেশি। পঞ্চদশ শতকে মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণভক্তির যে নতুন স্রোতধারা বাংলার মাটিতে প্রবাহিত করেছিলেন তার আগে থেকেই সম্ভবত এদেশের লোকসমাজে কৃষ্ণলীলার একটি আদিরসাত্মক কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেই কাহিনী বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ যেমন রূপ লাভ করেছে, তেমনি পরবর্তী কালের বহু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যে ভাগবতীয় কৃষ্ণ-কাহিনীর সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে বাঙালির কৃষ্ণপ্রীতির কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাগবত পুরাণকে অনুসরণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত পাঁচালিশ্রেণির কাব্য রচিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির কালানুক্রমিক পরিচয় নিম্নে সংক্ষিপ্তরূপে দেওয়া গেল—

(১) মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' : ভাগবত-পুরাণ অনুসরণে বাংলা ভাষায় রচিত যতগুলি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যের সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া গেছে তার মধ্যে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাল হিসেবে প্রথম। গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক ১৩৯৫ থেকে ১৪০২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ। কবি গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। এই গৌড়েশ্বর কে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কবির নিবাস কুলীন গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবত অনুসরণে রচিত হলেও এটিকে ঠিক ভাগবতের অনুবাদ বলা যায় না, ভাবানুবাদ বলাই ঠিক হবে। মালাধর মূলত দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করেছেন। দ্বাদশ স্কন্ধ অনুবাদ করেন নি তেমন নয়, দ্বাদশ স্কন্ধ থেকে 'কলিযুগের ফল বর্ণন' অংশটি তিনি গ্রহণ করেছেন। এই কাব্যে ভাগবত ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কিছু প্রভাবও লক্ষ করা যায়। তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত কথা শুনে সাধারণের বোধগম্য করে সহজ সরল রূপ দান করেছেন একথা কাব্যমধ্যে তিনি স্বীকার করেছেন—

"ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।।" [৬]

কাব্যের ভণিতায় বেশিরভাগ স্থানেই 'গুণরাজ খান' দেখা যায়—

"গুনরাজ খাঁন বলে কৃষ্ণের বিজয়ে।" [৭]

আমরা জানি, শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদনের মূলত দুটি দিক; একটি ঐশ্বর্যলীলা আর অপরটি মাধুর্যলীলা। মালাধর মূলত ঐশ্বর্যভাবের কবি। তাই তিনি তাঁর কাব্যে কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্যভাবযুক্ত বিষয়গুলিকেই অনুসরণ করেছেন। মালাধরের লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সত্ত্বাকেই প্রকাশ করা। আর এই বীররস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে শুধু সংক্ষেপকরণ নয়, নিজের কাব্যের কাহিনিকে সংহত রূপ দেবার প্রয়োজনে কোথাও কোথাও মালাধর দশম স্কন্ধের পুরো অধ্যায় পরিত্যাগ করেছেন।

১. ভাগবতের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিষয়ে নন্দরাজের সঙ্গে গোপগণের আলোচনা নামে একটি অধ্যায় আছে। মালাধরের কাব্যে এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

২. মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতের চৌত্রিশ অধ্যায়ের শঙ্খচূড় বধ ও তার পরেই ছত্রিশ অধ্যায়ের অরিষ্টাসুর বধের কাহিনি সংগৃহিত হয়েছে। কিন্তু মধ্যবর্তী পয়ত্রিশ অধ্যায়ের অন্তর্গত ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলাগীত সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, অধ্যায়টি বৃন্দাবনলীলার অন্তর্গত। মালাধরের লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণের বীরলীলা অর্থাৎ ঐশ্বর্যলীলা; আর অসুর নিধন ঐশ্বর্যলীলার অংশ তাই মালাধর শঙ্খচূড় বধ এবং অরিষ্টাসুর বধ কাহিনি গ্রহণ করেছেন। গোপীদের গীত

অংশটি তাঁর মনোপূত মনে হয়নি। মধুর রস মালাধরের কাব্যে প্রধান নয়। তাই যেখানে মধুর রস পরিবেশনের সুযোগ ঘটেছে মালাধর সেখানে নিজেকে সংযত রেখেছেন।

৩. ভাগবতে দ্বারকালীলায় উল্লেখ্যযোগ্য 'শ্রুতিগণের স্তুতি'। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই অংশটি নেই।

ভাগবতে যে সব কাহিনি সংক্ষেপে আছে মালাধর সে সব কাহিনির কিছু বিস্তার ঘটিয়ে ঘটনাটিকে পাঠকের কাছে আরও সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ভাগবতে যে সমস্ত কাহিনি সংক্ষেপে রয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মালাধর সেগুলি বিস্তৃত আকারে রচনা করেছেন তার একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল--

১. শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। সেটি হল কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশে কবির উৎসাহ। ভগবানের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশে কবি এতটাই উৎসাহী ছিলেন যে, ভাগবতে বর্ণিত অনেক সংক্ষিপ্ত কাহিনিকেও তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের আঠাশতম অধ্যায়ের করুণ কাহিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। কিন্তু কবি সেই কাহিনিকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

২. স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনা ভাগবতে রয়েছে। মালাধর সেই কাহিনিতে নিজস্ব কল্পনা জুড়ে কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন।

৩. ভাগবতে বলরাম-রেবতীর বিবাহ সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু মালাধর সেই কাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪. ভাগবতে পারিজাত হরণের কাহিনি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু মালাধর সেই কাহিনিকে অনেকটাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

৫. ভাগবতের দশম স্কন্ধের আঠাশতম অধ্যায়ে বরুণ দেবের মুখে পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণের মহিমার প্রকাশ ঘটেছে। এই কাহিনিতে মালাধরের হাতে বরুণ দেবের মুখের সংলাপ ব্যাবহার চরিত্রটিকে আরও জীবন্ত এবং কাহিনিটিকে অধিক বাস্তবানুগ করে তুলেছে।

ভাগবতে কিছু কিছু কাহিনি বিস্তৃত আকারে রয়েছে কিন্তু মালাধর সে সব কাহিনি অত্যন্ত সংক্ষেপিত আকারে বর্ণনা করেছেন। সেই ঘটনাগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল--

১. মালাধরের কাব্যে বাৎসল্য রসের বর্ণনা তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। ভাগবতের তুলনায় সেটি নিতান্তই অনুজ্জ্বল। ভাগবতের রজ্জুবন্ধনলীলায় শিশু কৃষ্ণের মনোরম স্বভাববৈশিষ্ট্যের সাথে যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তা অনুপস্থিত।

২. ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ বলরাম ও গোপসখাদের বাল্যলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কেবলমাত্র গোচারণলীলাই দুটি অধ্যায় জুড়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' কৃষ্ণ-বলরামের শৈশবলীলা অনুপস্থিত এবং গোচারণলীলা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে।

৩. ভাগবতের কৃষ্ণ-বিপ্রনারী সংবাদ অংশ অনেকটাই বিস্তৃত কিন্তু মালাধর সেটি সংক্ষেপে করেছেন। আসলে মধুর রসের পরকীয়া ঈশ্বর প্রেমের প্রতি কবির অনীহা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীদের ক্রন্দন ভাগবতে বিস্তৃত আকারে বর্ণিত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।

৫. শাল্ব বধের বিবরণ ভাগবতে খুব বিস্তৃত। কিন্তু মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বর্ণনা সংক্ষেপে করেছেন।

৬. কৃষ্ণের আবির্ভাবের পর বসুদেব ও দৈবকী কর্তৃক দীর্ঘ বন্দনা আছে ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বন্দনা অতিশয় সামান্য।

৭. ভগবানের জন্মের পরে গোকুল নগরে নানা রকম উৎসব করা হয়। এই প্রসঙ্গ ভাগবতে যেমন আছে মালাধর ও তাঁর কাব্যে রেখেছেন। ভাগবতে এই উৎসব উপলক্ষে গোপরমণীগণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু মালাধর তাঁর কাব্যের মূল কাহিনি পক্ষে গোপরমণীগণের এই বর্ণনা অত্যাবশ্যক বিবেচনা না করে যথার্থ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

৮. ভাগবতের দশম স্কন্ধের মোট আট অধ্যায় জুড়ে গোপী প্রসঙ্গ রয়েছে। সেই অধ্যায়গুলি হল—একুশ তম অধ্যায়, বাইশ তম অধ্যায়, উনত্রিশ থেকে তেত্রিশ তম অধ্যায় এবং পঁয়ত্রিশ তম অধ্যায়। এই আট অধ্যায়ের মধ্যে উনত্রিশ

থেকে তেত্রিশ মোট পাঁচ অধ্যায়ে রাসলীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত। কিন্তু মালাধর তাঁর কাব্যে গোপী প্রসঙ্গের কথা ও রাসলীলার কাহিনি অনেক সংক্ষেপিত আকারে উপস্থাপিত করেছেন। জানা যায় যে, বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা প্রাধান্য পেয়েছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে। তার আগে কৃষ্ণকথায় মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা প্রাধান্য পেত। চৈতন্যের আগে বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণই ছিল মুখ্য। গোপীরা ছিল কৃষ্ণ প্রেমের উপলক্ষ্য মাত্র। চৈতন্যের প্রভাবেই বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং কৃষ্ণলীলা রাধা ব্যতীত জমাট বাঁধে নি। এই জন্যেই হয়তো মালাধরের কাব্যে গোপীলীলা প্রাধান্য পায় নি।

(২) দ্বিজ গোবিন্দের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' : ষোড়শ শতকে যে সব কবির কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে দ্বিজ গোবিন্দ প্রথম। অনেকে অনুমান করেন যে দ্বিজ গোবিন্দ এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দের অনুগ্রহভাজন গোবিন্দ আচার্য একই ব্যক্তি। তাঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একটি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে আছে বলে ড. সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি বই আকারে মুদ্রিত হয়নি বলেই জানা যায়। দ্বিজ গোবিন্দ তাঁর কাব্যে ভাগবতের সমগ্র আখ্যানভাগ অনুসরণ করলেও প্রথম নয়টি স্কন্ধ খুব সংক্ষিপ্ত। দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের ওপর তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে কৃষ্ণলীলার লৌকিক ধারা দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত বড়ায়িরও উল্লেখ আছে বলে জানা যায়।

(৩) রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' : চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে রাধা-কৃষ্ণলীলা কথা নিয়ে অ-বাংলা ভাষায় রচিত অথচ বাংলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসেবে পাওয়া যায় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। পৌরাণিক কৃষ্ণের মহিমাকে সেখানে স্বীকৃতি জানালেও হরিবংশ ও ভাগবত বহির্ভূত রাধাই সেখানে কাব্যের নায়িকা। আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ পৌরাণিক কৃষ্ণের মহিমা থাকলেও লোকরুচি প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এর পাশাপাশি মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা নয়, ভাগবতীয় ভক্তিধর্মকে বাঙালি পাঠক-সমাজে বিস্তৃত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী এবং ষোড়শ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলকারদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর আবির্ভাবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার সমীকরণে এল এক উলট্‌পুরাণ। চৈতন্যের প্রভাবে শুধু পদাবলী সাহিত্যই প্রভাবিত হল না, ভাগবতের অনুবাদেও তার প্রভাব পড়ল সমান ভাবে। চৈতন্য পূর্ববর্তী কালে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য সত্তাকেই গ্রহণ করা হল বেশি সেখানে পরবর্তীকালে বড় হয়ে দেখা দিল শ্রীভগবানের মাধুর্য সত্তা। যদিও চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে ভাগবত কেন্দ্রিক কৃষ্ণলীলার এক বিশেষ প্রচার হয়েছিল, তা প্রাক্-চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্য, বিভিন্ন শিল্পকলার নিদর্শন, পোড়ামাটির কাজ প্রভৃতি দেখলেই বোঝা যায়। জানা যায় যে, ভাগবত পুরাণের অল্প-স্বল্প প্রচার আরম্ভ হয়েছিল খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে পূর্ব ভারতে। এই দেশে খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ভাগবতপুরাণের প্রচার বিশেষ ভাবে হয়েছিল মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্যমে। এরপর থেকেই বাংলায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও মথুরালীলা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বাঙালির কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। দেখা যায় যে, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, মালাধর বসু এঁরা সকলেই ভাগবত পুরাণের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখানেই যে, বাংলা ভাষায় ভাগবত পুরাণের অনুবাদ খুব বেশি হতে দেখা যায় নি। যে কয়েকটি অনুবাদ পাওয়া যায় তাও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদে যাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই দশম এবং একাদশ স্কন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য সমসাময়িক কালে যে কবিকে ভাগবতের মোটামুটি সব স্কন্ধের অনুবাদ করতে দেখা যায়, তিনি হলেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্য।

আনুমানিক ষোড়শ শতকে রঘুনাথ তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। তথ্যনিষ্ঠ, উচ্ছ্বাসবর্জিত এবং মূলের হুবহু অনুবাদ এই কাব্য। তিনি সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করলেও প্রথম নয়টি স্কন্ধ একটু সংক্ষিপ্ত কিন্তু শেষ তিনটি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। কলকাতার উত্তরে বরাহনগরে কবির নিবাস ছিল। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

"রঘু পণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'ও স্কন্ধ-অধ্যায় ধরিয়া ভাগবতের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।"[৮]

এই কাব্যের বেশির ভাগ ভণিতায় 'ভাগবতাচার্য' নাম পাওয়া যায়। যেমন-

"তবে শুন, কহি, ভাই, হরিগুণ গাথা।
কথাচ্ছলে কহিব শ্রীভাগবত-কথা।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত আচার্যের মধুরস-গান।।" [৯]

উপরোক্ত ভণিতা থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, রঘুনাথ কথাচ্ছলে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করবেন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাগবতাচার্য গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। ভণিতায় বহু স্থলেই গদাধরেরর নাম আছে। কবি কখনও কখনও ভণিতায় নিজের আসল নামও ব্যবহার করেছেন—

"কৃষ্ণগুণকর্ম, ভাই, শুন সাবধানে।
কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে।।" [১০]

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের রচনা কোন সময়ে হয়েছিল এই বিষয়ে গ্রন্থে কবি রচনাকাল সংক্রান্ত কোন নিদর্শন রেখে যান নি। এমনকি, তিনি কোনো রাজা বা জমিদারের নামও তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেন নি। যদি করতেন তাহলে এই কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় সহজ হত। তথাপি বলা যায় যে, এই গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীতে হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী বলার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত সন্ন্যাস গ্রহণের পরে চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বরাহনগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর ভাগবত পাঠ শুনে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি প্রদান করেছিলেন। এই কথা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য এই ঘটনার সময়কাল আনুমানিক ১৫১৪ - ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দ। 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখিত ব্রাহ্মণ, যাঁকে চৈতন্যদেব ভাগবতাচার্য উপাধি দিয়েছিলেন তিনি যে রঘুনাথ পণ্ডিত তা আগেই বলা হয়েছে। চৈতন্যদেবের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল এবং তিনি চৈতন্যদেবের কাছেই সুললিত কণ্ঠে ভাগবত পাঠ করে মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করেছিলেন। আমাদের মতে ভাগবতের বাংলা অনুবাদ তিনি তখনও করেন নি, করলে চৈতন্যভাগবতে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ থাকত। মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে তিনি ভাগবত নিয়েই জীবন কাটিয়েছিলেন এবং শুধু ভাগবত পাঠে সন্তুষ্ট না থেকে লৌকিক ভাষায় ভাগবত অনুবাদও করেছিলেন।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কার্য্যালয় থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। এছাড়াও বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সম্পাদিত একটি বঙ্গবাসী সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।

(৪) দ্বিজ মাধব বা মাধব আচার্য রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল': কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যধারার অপর উল্লেখযোগ্য কবি মাধবাচার্য। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাতা-পিতার নাম জানা যায়নি। ভাগবত অবলম্বনে কাব্য রচনা করলেও দ্বিজ মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যে ভাগবতবহির্ভূত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড লৌকিককাহিনী সংযোজিত হয়েছে। এই কাব্যে ভাগবত অতিরিক্ত অন্যান্য পুরাণেরও অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। ভণিতায় কবির নাম হিসেবে কোথাও পাওয়া যায় দ্বিজ মাধব, কোথাও মাধব, আবার কোথাও মাধবাচার্য। ভনিতায় তিনটি নাম থাকবার কারণে কবির আসল নাম কি তা নিয়ে সন্দিহান হওয়া যায় না। কবিশেখর দৈবকীনন্দন তাঁর কাব্যের বৈষ্ণব বন্দনায় লিখেছেন--

"মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।" [১১]

আবার বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

"তবে ত বন্দনা কৈলু মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ণগুণ বর্ণনা সদাই যাঁর কার্য্য।।
যে কৃষ্ণমঙ্গল কৈল ভাগবতামৃতে।
যে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে।।" [১২]

'আচার্য' তাঁর নাম না উপাধি তা জানা যায় না। গ্রন্থপাঠে- এও জানা যায় না যে, এটি উপাধি হলেও কার কাছ থেকে কেনই বা পেয়েছিলেন। 'প্রেমবিলাস' নামে একখানি গ্রন্থে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও তা প্রামাণিক সত্য নয় বলেই জানা যায়।

৫) কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ রচিত 'গোপালবিজয়' : ষোড়শ শতকের ভাগবত রচয়িতাদের মধ্যে কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কাব্যখানি ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত। কাব্যের বিষয় মূলত পুরাণানুসারী হলেও এতে পুরাণাতিরিক্ত দানলীলা ও নৌকালীলা সংযোজিত হয়েছে। কবি এ বিষয়ে গ্রন্থারম্ভেই অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"আর একখানি দোষ না লবে আহ্মার।
পুরাণের অতিরেক লেখিব আপার।।" [১৩]

পুরাণাতিরিক্ত লৌকিক কাহিনি কাব্যমধ্যে সন্নিবেশিত করবার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"কি কহিব আর জত অংশ-অবতারে।
দুষ্ট মারি সৃষ্টি রাখিল বারে বারে।।
সে সব প্রভুর যদি অবতার হএ।
তা সব বন্নিতে তনু মন নাহি লএ।।
একু গোপরূপে জত করিল বিলাস।
তাহাই কহিতে মনে অধিক উল্লাস।।" [১৪]

এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় কবি প্রাকৃতজনের প্রতি লক্ষ রেখেই কাব্য রচনা করেছেন। জনসমাজে কৃষ্ণলীলার যে ধারা প্রবাহিত ছিল তা তিনি পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে লোকপ্রিয় করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। এদিক থেকে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে এই কাব্যের সাদৃশ্য থাকলেও 'গোপালবিজয়' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত আদিরসাত্মক নয়। এই কাব্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, বীর, শৃঙ্গার প্রভৃতি একাধিক রসের সমন্বয়ে রচিত।

(৬) দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল': শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক অপর একটি মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ হলো দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল'। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সম্পাদক ভূমিকা অংশে বলেছেন—

> *"দুঃখী শ্যামদাস কাশীরাম দাসের ন্যায় সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না। আর তিনি কৃষ্ণগুণকীর্তন দ্বারা ভক্তোচিত কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং ইহাতে তিনি কেবল রচনা-নৈপুণ্য দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। গোবিন্দমঙ্গল ভক্তি গ্রন্থ; কাব্য গ্রন্থ নহে"* [১৫]

কিন্তু মূল গ্রন্থে বহু রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে এই গ্রন্থ আসলে জ্ঞেয় কাব্য। মূলত ভাগবতের দশম স্কন্ধ এবং প্রথম দুই ও শেষ দুই স্কন্ধ থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে এই কাব্য রচিত হলেও এই কাব্যে লৌকিক দান ও নৌকা লীলার বর্ণনাও প্রাধান্য পেয়েছে। মনে হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দান ও নৌকালীলা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণার হরিহরপুর নামে গ্রামে কবির বাস ছিল। জাতিতে কবি ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ। তাঁর পিতার নাম হল শ্রীমুখ, মায়ের নাম ভবানী। তিনি কোন সময়ের তা সঠিক ভাবে বলা না গেলেও ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রাপ্ত একটি সনদে তাঁদের জমির অধিকারের প্রসঙ্গে রয়েছে যে, এই জমি 'সন দেওয়ানীর পূর্ব হইতে' তাঁদের দখলে আছে। ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ হয় ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। তাহলে কবি সেই সময়ের থেকে আরও অনেকটা পূর্বের বোঝা যায়। দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলের প্রথমে বিষ্ণুবন্দনা ও পরে সর্বদেব বন্দনা রয়েছে। কাব্যের ভণিতায় কখনও 'দুঃখী শ্যামদাস' আবার কখনও শুধু 'দুঃখী শ্যাম' শব্দ দেখা যায়—

"গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখী শ্যামদাস ভাষে
বিষ্ণু বন্দি বন্দো দেবগণে।।" [১৬]

আবার অন্যত্র -

"বৃষভ কপিলা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন।
দুঃখী শ্যাম আশা করে গোবিন্দচরণ।।" [১৭]

ভণিতা থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, দুঃখী শ্যাম তাঁর প্রকৃত নাম আর 'দাস' ভক্তিব্যঞ্জক উপাধি মাত্র। সংসার সাগর উত্তরণের উদ্দেশ্যে এবং হরিগুণানুকীর্তনের জন্য কবি 'গোবিন্দমঙ্গল' রচনা করেছিলেন।

(৭) কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' : শ্রীমদ্ভাগবত-এর কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করলেও তিনি কোথাও যথার্থ অনুবাদের রীতি গ্রহণ করেননি। ভাগবত থেকে কাহিনি চয়ন করে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে স্বাধীন কাব্য রচনা করেছেন মাত্র। তাঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে ভাগবতবহির্ভূত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ডের কাহিনি আছে। নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড বিষয়ে কবি হরিবংশের দোহাই দিয়েছেন—

"দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে, অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে।" [১৮]

কবি কৃষ্ণদাস গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী কোনো এক স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পিতার নাম যাদবানন্দ ও মাতা পদ্মাবতী। কাব্য রচনার সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভবপর না হলেও অনুমিত হয় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। ড. সেনের মতে কবি কৃষ্ণদাস 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধব আচার্যের সেবক ছিলেন। কারণ হিসেবে বলা যায়, সেবকের রচনা দেখে মাধব বলেছিলেন—

"দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার
এখানে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার।" [১৯]

(৮) অনন্ত কন্দলী রচিত 'ভাগবতের দশম স্কন্ধ' : কামরূপের অন্তর্গত হাজো-নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন অনন্ত কন্দলী। তাঁর পিতার নাম ছিল রত্ন পাঠক। 'অনন্ত কন্দলী' তাঁর উপাধি মাত্র। অনন্ত কন্দলীর আরও একটি উপাধি ছিল, সেটি ছিল 'চন্দ্রভারতি'। জানা যায় যে তিনি শঙ্করদেবের শিষ্য ছিলেন। তিনি শঙ্করদেব রচিত ভাগবত দশম স্কন্ধের অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করেন। সেই কারণেই তাঁর রচনায় শঙ্করদেবের রচনার অনুসরণ লক্ষ করা যায়। ভাগবত অবলম্বনে কাব্য রচনা করলেও তাঁর রচনায় হরিবংশের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

(৯) শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' : ১৩২৬ বঙ্গাব্দে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসের একটি পুথি। এই পুথিতে সম্পাদক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণদাসকে মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয়টিকে নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের' (১ম, অপরার্ধ) তৃতীয় সংস্করণে। শ্রীকৃষ্ণদাস তাঁর বিরচিত কাব্যের অধিকাংশ ভণিতায় কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' বলেই উল্লেখ করেছিলেন। শুধুমাত্র দু-এক জায়গায় কাব্যের নাম 'ভাগবতসার'ও বলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা আনুমান করতে পারি যে, ভাগবত অনুসরণে কাব্য রচনা করেছিলেন বলেই কবি একে 'ভাগবতসার' আখ্যা দিয়েছিলেন। ভাগবতবহির্ভুত বহু বিষয়ের বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণদাসের কাব্যে রয়েছে। আর এইসব বিষয়ের ওপর দৃষ্টিপাত করেই বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণদাস ভাগবতের যথাযথ অনুবাদ করেননি।

(১০) শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ঘনশ্যামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' : কবির ভনিতা থেকে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণদাস এবং ঘনশ্যামদাস উভয়েরই উপাধি ছিল শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। তবে কবি কাব্যের কোন কোন জায়গায় শুধুমাত্র 'কিঙ্কর' অথবা 'কিঙ্কর দ্বিজ'ও ব্যবহার করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্যের নাম হলেও কোনো পুথিতে 'হরিবংশ', 'ভাগবত' অথবা 'ব্রহ্মবৈবর্ত' নামেরও উল্লেখ রয়েছে। কবি কাব্যের উপকরণ সংগ্রহে শুধুমাত্র ভাগবতের ওপর নির্ভর করেননি। এক্ষেত্রে কবি হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণাদি থেকেও তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কাব্যটি এখনও অমুদ্রিত বলেই জানা যায়।

(১১) পরশুরাম-রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য' : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচয়িতা দুজন পরশুরামের নাম পাওয়া যায়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, দু'জনই সপ্তদশ শতকের কবি এবং দু'জনই ব্রাহ্মণ। একজন পরশুরাম চক্রবর্তী, অপরজন পরশুরাম রায়। ড. সুকুমার সেনের মতানুযায়ী, পরশুরাম চক্রবর্তী ছিলেন শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কোনো এক স্থানের অধিবাসী। সম্ভবত পরশুরাম তাঁর নাম এবং চক্রবর্তী তাঁর উপাধি। পরশুরামের কাব্য সম্পর্কে সম্পাদক শ্রীনলিনী নাথ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—

"অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলের তুলনায় পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল নিকৃষ্ট নয়। বরং অধিকাংশগুলির চেয়ে ইহার কবিত্ব অনেক বেশী সরস ও প্রাণবন্ত।" [২০]

পরশুরাম সমগ্র ভাগবত পুরাণের বা শুধুমাত্র দশম স্কন্ধেরও অনুবাদ করেন নি। তিনি প্রথম স্কন্ধ থেকে শেষ দুই অধ্যায়, চতুর্থ স্কন্ধ থেকে ধ্রুব চরিত্র, ষষ্ঠ স্কন্ধ থেকে অজামিল উপাখ্যান, সপ্তম স্কন্ধ থেকে প্রহ্লাদ চরিত্র এবং অষ্টম ও নবম স্কন্ধ থেকে অল্প করে কাহিনি বর্ণনা করে দশম স্কন্ধ আরম্ভ করেছেন। দশম স্কন্ধেও তিনি শুধুমাত্র ঊননব্বই অধ্যায়ের প্রথম ভাগের বিবরণ দিয়েছেন মাত্র। পরশুরামের কাব্যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে কৃষ্ণকথাবহির্ভুত কিছু উপাখ্যান। এর মধ্যে দোললীলা অন্যতম।

পরশুরাম রায় বিরচিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের নাম হল 'মাধবসঙ্গীত' বা 'সঙ্গীতমাধব'। ড. সুকুমার সেনের মতে দামোদরের উত্তর কূলে চম্পকনগরী নামে এক গ্রামে কবির পুরুষানুক্রমে বসতি ছিল। তিনি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর পিতার নাম মধুসূদন, পিতামহ সুবুদ্ধি রায়, প্রপিতামহ হরি রায়। তাঁর রচিত কাব্যখানি গীতবহুল।

(১২) ভবানন্দের 'হরিবংশ' : হরিবংশ নাম হলেও এই কাব্যটির সঙ্গে মহাভারতের পরিশিষ্ট 'খিল হরিবংশ'-এর কোনো সম্পর্ক নেই। অনুমান করা হয় যে, 'হরিবংশ' নামে অন্য কোনো কাব্য ছিল, যদিও সেই কাব্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। সে যাই হোক, ভবানন্দের 'হরিবংশ' কাব্যটি হল কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য। এই কাব্যে ভক্তিরস অপেক্ষা আদিরসই প্রাধান্য লাভ করেছে। লক্ষণীয় বিষয়-- কবি কাব্যে তাঁর আত্মপরিচয় হিসেবে কিছুই উল্লেখ করেন নি। ভণিতা অংশ থেকে এতটুকুই জানতে পেরেছি যে, কবি 'শিবানন্দ-সুত' ছিলেন। ভবানন্দ শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী হওয়ার দরুণ কাব্যে উল্লেখিত গানগুলি ওই জেলার মুসলমান সমাজে সমাদৃত ছিল অনুমিত হয়। কাব্যের ভণিতায় কখনও ভবানন্দ দীন, কখনও দীন ভবানন্দ আবার কখনও শুধু ভবানন্দ নাম পাওয়া যায়। যেমন-

"পাইয়া সারদার বর শ্লোক ভাঙ্গি মনোহর
রচিলেক ভবানন্দ দীন।।" [২১]

আবার ওই পৃষ্ঠায় এক জায়গায় দেখা যায়-

"পরাশর-সুত ব্যাস জন্ম বিষ্ণু-অংশ।
সংক্ষেপে রচিত পুণ্যশ্লোক হরিবংশ।।
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোক বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে।।" [২২]

আবার অন্যত্র দেখা যায়-

"দান দিয়া ঘরে যাও বোলে ভবানন্দে।।" [২৩]

এই উপরিউক্ত ভণিতা থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, কবি ভবানন্দ সংস্কৃত হরিবংশ থেকেই তাঁর কাব্য রচনার রসদ পেয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষা সাধারণ লোকের বোধগম্য না হবার কারণেই তিনি 'লোক বুঝিবারে' তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভবানন্দের 'হরিবংশ' সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

(১৩) বলরামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' : অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যগুলির মধ্যে বলরামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বন করে বলরামদাস মূলত তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুমান অনুযায়ী বলরামদাস ছিলেন সহজিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ১৬২৪ শক অর্থাৎ ১৭০২ খ্রিস্টাব্দকে কবি তাঁর কাব্য রচনার কাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

(১৪) দ্বিজ রমানাথের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' : মূল ভাগবতকে অনুসরণ করেই দ্বিজ রমানাথ মূলত তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে এই কাব্যে স্থান পেয়েছে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডও। কাব্যটির রচনাভঙ্গি সহজ-সরল।

(১৫) শঙ্কর চক্রবর্তীর 'ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' : বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের (১৭১২–১৭৪৮) সভাকবি ছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী। কাব্যে দেওয়া কবির আত্মপরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি মল্লভূমির অন্তর্গত লোগোর দক্ষিণ দিকের পানুয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কবির পিতা ছিলেন মুনিরাম চক্রবর্তী। শঙ্কর-রচিত কাব্যটি আকারে বৃহৎ। ভাগবত ছাড়াও এই কাব্যে ভবিষ্যপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনির অবতারণা কোথাও কোথাও লক্ষণীয়। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে শঙ্কর চক্রবর্তীর কাব্যের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।

(১৬) অভিরামদাসের 'গোবিন্দবিজয়' : ভাগবতকে অনুসরণ করেই অভিরামদাস তাঁর 'গোবিন্দবিজয়' কাব্যটি রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি বর্ণনাময় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য। কিন্তু কাব্যে মাঝে মাঝে রাগের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, কাব্যটি গান করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। কবি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ এবং তাঁর কৌলিক উপাধী ছিল 'দত্ত'। অনুমান করা হয় যে, কবি সম্ভবত মল্লভূমের অধিবাসী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে গোবিন্দমঙ্গল কাব্যে কবিচন্দ্রকে অভিরামদাসের রচনা উদ্ধৃত করতে দেখা যায়। এ থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে, অভিরামদাস সপ্তদশ শতকের কবি। কাব্যের ভণিতায় কবিকে নিজের নাম ব্যাবহার করতেই দেখা যায়—

"গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ সিন্ধু।
মুহু মুহু সানন্দে পিয় রে ভাই বন্ধু।।
এমন অমৃত পানে সভাকার আস।
বঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণগুনে অভিরামদাস।।" [২৪]

উপরিউক্ত কাব্যগুলির মধ্যে আমরা একমাত্র রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-কেই ভাগবতের যথাযথ অনুবাদ বলতে পারি। কারণ ভাগবত বহির্ভূত প্রসঙ্গ তিনি তাঁর কাব্যে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছেন। এমনকি, ভাগবত ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ পর্যন্ত তিনি করেন নি। এখানেই কবি রঘুনাথের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক কালের অন্যান্য ভাগবত অনুবাদকের পার্থক্য। দেখা যায়, অন্যান্য কাব্যগুলির মধ্যে কোনটি ভাগবত অনুসরণে রচিত স্বাধীন রচনা, কোনটিতে আবার ভাগবতের কাহিনি অনুসৃত হয়েছে মাত্র। কিন্তু একটি কথা বলা যায় যে, এগুলির মধ্যে পুরাণ-বহির্ভূত কৃষ্ণলীলার লৌকিক ধারাটিকে সযত্নে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- কবি শেখর দৈবকীনন্দন সিংহ তাঁর 'গোপাল বিজয়' কাব্যে ভাগবত বহির্ভূত লৌকিক দানলীলা, নৌকালীলা পর্যায় বর্ণনা করেছেন। আবার 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের কবি দুঃখী শ্যামদাস রাধাকে কৃষ্ণের মাতুলানী করে গড়ে তুলেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসরণে। সেই দিক থেকে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের কবি অনেক বেশী ভাগবত অনুগত। ভাগবতে যেমন রাধানাম অনুপস্থিত তেমনি তাঁর রচনাতেও রাসলীলা প্রসঙ্গে রাধার নাম মাত্র একবার উচ্চারিত হতে দেখা যায়। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে কোন বাঙালি কবির পক্ষে এই সংযম সত্যিই প্রশংসনীয়।

তথ্যসূত্র :

১। সেন, দীনেশচন্দ্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'(১ম খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা ১২৯
২। দাস, দুঃখী শ্যাম : 'গোবিন্দমঙ্গল', ঈশানচন্দ্র বসু (সম্পাদিত), বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৭ সাল, পৃষ্ঠা ভূমিকা-১
৩। চট্টোপাধ্যায়, গীতা : 'ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য, কবি ও কবিতা, ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ১১৭
৪। সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৪০, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৩, পৃষ্ঠা ৯৮
৫। চট্টোপাধ্যায়, গীতা : প্রাগুক্ত, পৃষ্টা-১৭৯
৬। বসু, মালাধর : 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', খগেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদিত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯, পৃষ্ঠা ৩
৭। বসু, মালাধর : 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১
৮। সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৭
৯। ভাগবতাচার্য, রঘুনাথ : 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ (সম্পাদিত), গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা-০৩, পৃষ্ঠা ৩

১০। ভাগবতাচার্য, রঘুনাথ : 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪
১১। সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৮
১২। চট্টোপাধ্যায়, ড. রবিরঞ্জন : 'কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ- ১ ডিসেম্বর ১৯৮২, রাস পূর্ণিমা ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ৪৭
১৩। সিংহ, কবিশেখর দৈবকীনন্দন : 'গোপালবিজয়', দুর্গেশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদিত), বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, সাহিত্য প্রকাশিকা ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ- ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭
১৪। সিংহ, কবিশেখর দৈবকীনন্দন : 'গোপালবিজয়', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬
১৫। দাস, দুঃখী শ্যাম : 'গোবিন্দমঙ্গল', ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৭ সাল, পৃষ্ঠা -৩
১৬। দাস, দুঃখী শ্যাম : 'গোবিন্দমঙ্গল', ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৭ সাল, পৃষ্ঠা ১
১৭। দাস, দুঃখী শ্যাম : 'গোবিন্দমঙ্গল', ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৭ সাল, পৃষ্ঠা ৫
১৮। সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৪০, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৩, পৃষ্ঠা ৪০৫
১৯। সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৪০, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৩, পৃষ্ঠা ৩৮৪
২০। চক্রবর্তী, পরশুরাম : 'কৃষ্ণমঙ্গল', শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-১৩, ১৩৬৪, পৃষ্ঠা ভূমিকা-১
২১। নন্দ, ভবা : 'হরিবংশ', শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, সন ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ৭
২২। নন্দ, ভবা : 'হরিবংশ', শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, সন ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ৭
২৩। নন্দ, ভবা : 'হরিবংশ', শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, সন ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ১৩
২৪। মন্ডল, পঞ্চানন : 'পুঁথি- পরিচয়', দ্বিতীয় খণ্ড, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৬৪, মার্চ ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ৮০